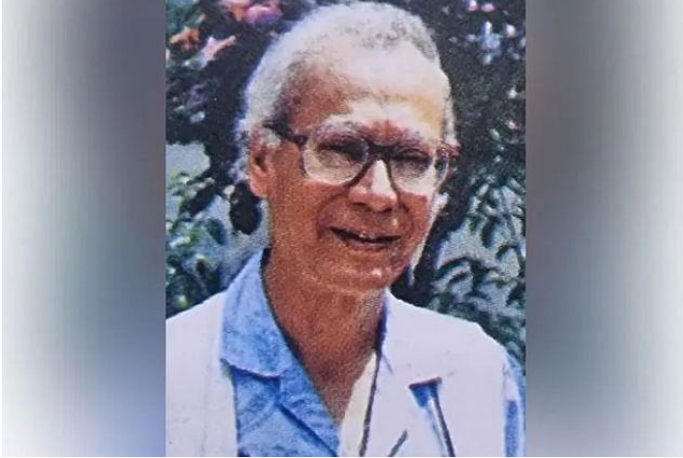


প্রথম আলো

অধ্যাপক আনিসুর রহমান ‘দারিদ্র্য নিবাসন’ কথাটায় বিশ্বাস করতেন না

মইনুল ইসলাম

প্রকাশ: ১২ জানুয়ারি ২০২৫, ১০: ০০



অধ্যাপক আনিসুর রহমানছবি: সৈয়দ জাকির হোসাইনের সৌজন্যে পাওয়া

আমার শিক্ষক, শিক্ষাগুরু ও পথপ্রদর্শক অধ্যাপক আনিসুর রহমান ৫ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে মৃত্যুবরণ করেছেন (ইল্লা লিল্লাহি ওয়া ইল্লা ইলাইহি রাজিউন)। ১৯৭২ সালে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র, তখন বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য আনিসুর রহমান তাঁর কমিশনের কর্মপরিধি কিছুটা কমিয়ে আমাদের ‘মাইক্রো-ইকোনমিকস’ কোর্সটি পড়ানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। (যদিও ১৯৭১ সালে আমাদের এমএ পাস করার কথা ছিল, কিন্তু ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের কারণে আমরা প্রায় দেড় বছর সেশন-বিলম্বের শিকার হয়েছিলাম)।

ওটা ছিল আমার বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনের সবচেয়ে সেরা অর্জন, সেশন-বিলম্ব না হলে আমি আমার শিক্ষাজীবনের সেরা শিক্ষক প্রফেসর আনিসুর রহমানের সরাসরি ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতাম, কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের আগে তিনি পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অবস্থিত কায়েদে আজম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। সেই ১৯৭২ সাল থেকেই ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রফেসর আনিসুর রহমান ছিলেন আমার ‘ফিলসফার-গাইড’ ও সার্বক্ষণিক শিক্ষাগুরু, সারা জীবন আমি তাঁকেই অনুসরণ করার সর্বাত্মক প্রয়াস অক্ষুণ্ন রেখেছিলাম। আনিসুর রহমান আদতে ছিলেন একজন ‘অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতি-দার্শনিক’, যাঁর তুল্য বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে আর কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। বক্ষ্যমাণ কলামে আমি আনিসুর রহমানের দর্শনের দিকেই মনোযোগ দিতে চাই।

আনিসুর রহমান কখনোই ‘দরিদ্র’ এবং ‘দারিদ্র্য নিরসন’ কথা দুটো ব্যবহার করতেন না। সমাজের প্রান্তিক অবস্থানের জনগণকে তিনি সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী (ডিজ-অ্যাডভান্টেজড পিপল) আখ্যায়িত করতেন। কারণ, তাঁর দার্শনিক অবস্থান ছিল একটি দেশে বিদ্যমান ‘সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির সিস্টেম’ সার্বক্ষণিকভাবে দারিদ্র্য সৃষ্টি এবং পুনঃসৃষ্টি করে চলেছে। এই ‘সিস্টেম’ পরিবর্তন করাকে মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে মোকাবিলা না করলে শুধু ‘অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি’ কিংবা ‘মাইক্রোক্রেডিট’ দিয়ে কখনোই টেকসইভাবে দারিদ্র্যকে মোকাবিলা করা যাবে না।

২০০৭ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধ Poverty, Overcoming Poverty and Self-Realization-এ প্রদত্ত তাঁর একটি স্মরণীয় উক্তির বাংলা অনুবাদ উপস্থাপনের মাধ্যমে এ সম্পর্কে তাঁর অবস্থানটি তুলে ধরছি, ‘যত দিন এভাবে দারিদ্র্য সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির প্রক্রিয়াটি চলতে থাকবে তত দিন দারিদ্র্যকবলিত গোষ্ঠীর আয়কে ধাপে ধাপে বাড়ানোর মাধ্যমে দারিদ্র্য কমানোর প্রয়াসগুলো প্রকৃত প্রস্তাবে হয়ে দাঁড়াবে একটি নিচের দিকে চলমান এসকেলেটর ব্যবহার করে ওপরে ওঠার মতো কঠিন কাজ। এ রকম প্রয়াস সিস্টেম থেকে কখনোই দারিদ্র্যকে নির্মূল করতে পারবে না যদি ওই এসকেলেটরের নিম্নগামী পতনকে (ডাউনওয়ার্ড গ্লাইড) সুইচ অফ করে বন্ধ না করা হয়। এই সুইচ অফ করার ব্যাপারটি হলো সমাজের কাঠামোগত রূপান্তরের মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান অর্থনৈতিক সম্পদ ও সামাজিক ক্ষমতার পুনর্বন্টনের লক্ষ্য অর্জন।’

মানুষকে মাইক্রোক্রেডিট কিংবা এনজিও ঋণসহায়তার ‘টাগেট’ হিসেবে বিবেচনা করে দারিদ্র্য নিরসন করতে চাইলে সেটা মনুষ্যত্বকে অপমান করার শামিল হবে। আনিসুর রহমান মনে করতেন, বিশ্বব্যাংক অনুসৃত মাথাপিছু জিডিপির মাধ্যমে কিংবা দৈনিক ক্যালরি গ্রহণের পরিমাপক দিয়ে দারিদ্র্য পরিমাপ করার মানে হলো মানুষকে গরু-ছাগলের পর্যায়ে নামিয়ে আনা। তিনি ‘দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠীর অনুপাতকে’ বলতেন ‘লাইভস্টক কনসেপ্ট অব পোভার্টি’। এ ধরনের কনসেপ্টগুলো যে বাংলাদেশের জনগণকে অভূতপূর্ব নির্ভুরতার সঙ্গে লুণ্ঠনের ব্যাপারটিকে শাসকমহল কর্তৃক লুকিয়ে ফেলার জন্য অপব্যবহার করা হয়েছে, পতিত স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার সরকার উৎখাতের পর সে ব্যাপারটি এখন দিবালোকের মতো স্পষ্টভাবে উদ্ঘাটিত হয়ে চলেছে।

গত সাড়ে পনেরো বছরের স্বৈরশাসনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু জিডিপি প্রশংসনীয়ভাবে বাড়ছে মর্মে ‘ডেটা ডক্টরিং’-এর মাধ্যমে ম্যানুফ্যাকচার (ভুয়া) পরিসংখ্যান প্রতিবছর সৃষ্টি করে শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে লুটেপুটে ছারখার করে দিয়েছেন। প্রফেসর আনিসুর রহমানের দর্শনের ওপর ভিত্তি করে আমার রচিত ও ২০০৯ সালে রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ (রিইব) কর্তৃক প্রকাশিত দ্য পোভার্টি ডিসকোর্স অ্যান্ড পার্টিসিপেটরি অ্যাকশন রিসার্চ ইন বাংলাদেশ শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থের মূল বক্তব্যটি এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই ধারণ করে রয়েছে।

প্রফেসর অমর্ত্য সেন এবং ড. মাহবুবুল হকের মানব উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি মাথাপিছু জিডিপির সংকীর্ণ কনসেপ্ট থেকে দারিদ্র্য ডিসকোর্সকে কিছুটা মুক্ত করলেও আরও অনেক কিছু বিবেচনা থেকে এখনো বাদ রয়ে গেছে। উন্নয়নে অমর্ত্য সেনের ‘এনটাইটেলমেন্ট’ ও ‘ক্যাপাবিলিটি’ ধারণাগুলোকে আনিসুর রহমান সমর্থনযোগ্য মনে করলেও তিনি ওখানে থামতে নারাজ। তিনি উন্নয়নকে বিবেচনা করেন ‘মানুষের সৃজনশীল শক্তির স্বাধীনতা অর্জন’ (লিবারেশন অব পিপল’স ক্রিয়েটিভ এনার্জি), যেখানে আত্মবিকাশের অদম্য ইচ্ছা (আর্জ ফর সেলফ-রিয়লাইজেশন) প্রধান নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে।

শুধু অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করে এহেন ইচ্ছাপূরণ সম্ভব না-ও হতে পারে। সমাজে বিদ্যমান বহু ধরনের বঞ্চনা ও গ্লানি নিরসন এহেন আত্মবিকাশের অংশ হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে একজন হরিজনের অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জনের চাইতে সামাজিক সমমর্যাদা অর্জনের লড়াইয়ের অগ্রাধিকারকে উল্লেখ করা যায়। এ ব্যাপারে রাষ্ট্র ও বাজারের তুলনামূলক ভূমিকার চয়নের পাশাপাশি কমিউনিটি ও জনগণের ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠীগত প্রয়াসকেও আনিসুর রহমান সমভাবে গুরুত্ব দিতে বলেছেন।

সারা বিশ্বে ‘পার্টিসিপেটরি অ্যাকশন রিসার্চের’ তিনজন আণ্ডিয়ান চিন্তানায়কদের (পাইওনিয়ার) মধ্যে আনিসুর রহমান ছিলেন একজন—বাকি দুজন ছিলেন ব্রিটেনের পিটার চ্যাম্বার্স এবং কলম্বিয়ার অরল্যান্ডো ফল্‌স-বোর্দা। আনিসুর রহমান পার্টিসিপেটরি অ্যাকশন রিসার্চের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন ‘গণগবেষণা’—যার মূল কথা হলো সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী নিজেরাই নিজেদের গণগবেষণার মাধ্যমে তাঁদের বঞ্চনা ও সুবিধাহীনতার কারণ বের করতে হবে।

সরকার কিংবা কোনো এনজিওর প্রতিনিধি তাঁদের প্রতিনিধি হয়ে এই বঞ্চনার কারণ উদ্ঘাটন করে দেবে না। বাইরের কেউ ভূমিকা রাখতে চাইলে সাময়িকভাবে শুধু ‘উদ্দীপক’ (এনিমেটর) কিংবা ‘অসুবিধা-লাঘবকারী’র (ফেসিলিটেটর) ভূমিকায় থাকতে পারে। সে জন্য তিনি পাড়ার সবাইকে মাসে অন্তত দুবার উঠান বৈঠকে মিলিত হয়ে গণগবেষণার মাধ্যমে নিজেদের সমস্যার কারণ বের করা এবং সম্ভাব্য সমাধান ঠিক করাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। পরবর্তী বৈঠকে প্রস্তাবিত পদক্ষেপের সাফল্য-ব্যর্থতার মূল্যায়ন করে নতুন পথ নির্ধারণের কথা বলেছেন তিনি।

পাকিস্তানের ‘টু ইকোনমি থিসিসের’ অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ছিলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাজউদ্দীন যখন ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ও প্রবাসী সরকার গঠনের বিষয়ে আলোচনা চালিয়েছিলেন তখন আনিসুর রহমান এবং রেহমান সোবহান ছিলেন তাজউদ্দীনের ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতা ও সহ-আলোচক।

এভাবে সুবিধাবঞ্চিত জনগণ নিজেরাই নিজেদের ‘কর্তা’ হয়ে বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে হবে, তারা বাইরের কোনো এনজিও কিংবা সরকারের খয়রাতি সাহায্যের মুখাপেক্ষী ‘টার্গেট পপুলেশন’ হবে না। এই গণগবেষণার দর্শনকে মার্চপর্ষায়ে অনুশীলনের জন্যই তাঁর অনুগামীরা ‘রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ’ গড়ে তুলেছেন, যা দুই দশকের বেশি সময় ধরে দেশে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রফেসর আনিসুর রহমান তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর কয়েক বছর ধরে নিজেকে অনেকখানি গুটিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৭২-৭৩ পর্যায়ে বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশনের সবচেয়ে প্রগতিশীল সদস্য হিসেবে সবার চাইতে বেশি সমীহ আদায় করেছিলেন আনিসুর রহমান। ষাটের দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী তাত্ত্বিক হিসেবেও ছাত্রছাত্রী ও ওয়াকিবহাল মহলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন তিনি।

পাকিস্তানের ‘টু ইকোনমি থিসিসের’ অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ছিলেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাজউদ্দীন যখন ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ও প্রবাসী সরকার গঠনের বিষয়ে আলোচনা চালিয়েছিলেন তখন আনিসুর রহমান এবং রেহমান সোবহান ছিলেন তাজউদ্দীনের ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতা ও সহ-আলোচক। ১৯৭২ সালে পরিকল্পনা কমিশন বাংলাদেশের যে ‘ভূমি সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়ন’

করেছিল, ওই প্রস্তাবের রচয়িতা ছিলেন আনিসুর রহমান। যখন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী তাজউদ্দীন বঙ্গবন্ধুর কাছে বিবেচনার জন্য ওই প্রস্তাবমালা পেশ করেছিলেন, তখন শেখ মনি ও তোফায়েল আহমেদের মতো পুঁজিবাদ-ভক্তদের সমালোচনার কারণে ওই প্রস্তাবগুলো গ্রহণযোগ্য মনে করেননি বঙ্গবন্ধু।

১৯৯৩ সালে আনিস স্যার আমাকে ওই প্রস্তাবসমূহের সাইক্লোস্টাইল কপিটি দিয়ে ভূমি সংস্কার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনার দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। একটি দুর্ঘটনার কারণে আমি বিষয়টি যথেষ্ট গভীরভাবে গবেষণা করতে পারিনি, কিন্তু আমার প্রবন্ধে প্রস্তাবগুলো হুবহু অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমরা একটি অর্থবহ ভূমি সংস্কার আইন যে এখনো পাস করতে পারলাম না, সে ব্যর্থতার কাহিনিটা এখানেই পাওয়া যাবে।

তাজউদ্দীন নাকি হাউমাউ করে কেঁদেছিলেন বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাখ্যানের পর। মূলত ওই প্রত্যাখ্যানের কারণেই প্রফেসর আনিসুর রহমান পরিকল্পনা কমিশনের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন। আরো দুঃখজনক হলো, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রফেসর আনিসুর রহমানকে কী অজ্ঞাত কারণে গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিলেন। শুভাকাঙ্ক্ষীরা যথাসময়ে খবরটি তাঁকে জানানোয় তিনি তড়িঘড়ি করে দেশত্যাগ করেছিলেন।

আইএলও তে চাকরি করার সময় প্রফেসর আনিসুর রহমান তাঁর ‘পার্টিসিপেটরি অ্যাকশান রিসার্চ’ এবং ‘সেলফ ডেভেলপমেন্টের’ ধারণাগুলোকে বিশ্বের অনেক দেশে সফলভাবে প্রয়োগ করেছেন। লন্ডন থেকে প্রকাশিত তাঁর ‘সেলফ ডেভেলপমেন্ট’ বইটি দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়ন সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হয়ে চলেছে। আমি প্রফেসর আনিসুর রহমানের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

- **ড. মইনুল ইসলাম** অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়